তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা

কাজী নজরুল ইসলাম

গত ভাদ্র সংখ্যা ‘‘ভারতবর্ষে’’ সুলেখক হেমেন্দ্র বাবুর ‘সঞ্চয়ে’ ‘‘তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা’’ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে বোধ হয় অনেকেই ক্ষুন্ন হয়েছেন। ততোধিক মর্মাহত হয়েছেন বোধ হয় আমাদের নতুন কবি ভায়ারা। লেখাটা যে তাঁদের নাকের ডগায় মূর্তিমান রসভঙ্গের মত আবির্ভুত হয়ে তান্ডব নৃত্য করে গেছে। সেই ‘মান্ধাতার আমলের পুরানো’ এক মহাকবি-প্রসিদ্ধিতে এমন একটা প্রচন্ড লাঠ্যাঘাত, কি সাংঘাতিক কথা।

তবে ও সম্বন্ধে এ গরিবের যৎকিঞ্চিত কথা আছে।

প্রথমত New York Herald নামক আমেরিকান সংবাদপত্রের অচিন লেখকের তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার ভয়ানক একটা খট্‌কা বেঁধে গেছে। আজকাল অনেক লেখক ঘরে বসেই দুনিয়ার যে-কোন স্থানের ভ্রমন-কাহিনী লিখে থাকেন, এ একটি নিষ্করুণ সত্যি কথা। তাঁরা হয় বিখ্যাত ভ্রমনকারীর কাছ থেকে শুনে নতুবা কোন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে এবং তাতে কিছু ঘরের তেল-মসলা সংযোগ করে আমাদের সামনে এনে হাজির করেন এবং আমরাও ‘‘কৃতার্থ’’ হয়ে যাই। আমিও ঐ লেখা পড়েছি, তাতে তিনি যে তুর্কদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তা কিছুতেই বোঝা যায়না। হতে পারে তিনি কিছুদিন বা খুব বেশী দিন সেখানে ছিলেন, কিন্তু তিনি - আমার যতদূর সম্ভব সাদা চোখে কিছুই দেখেননি। ‘সাহেব’ তুর্কদের সম্বন্ধে অন্যান্য যে-সব বাজে বকেছেন, সে-সম্বন্ধে কিছু না বলে আমি কেবল তুর্ক মহিলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে দু’চারটি কথা বলে এই নীরস গদ্যের অবসান করব।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যে পৌরাণিক প্রবাদের মত তুর্ক তরুণীর বিশ্ব-বিমোহিনী সৌন্দর্যের গুণ-কীর্তন হয়ে আসছে, আর শুধু পাশ্চাত্য প্রদেশ কেন, জগতের সমস্ত দেশের নূতন-পুরাতন সকল কবি ও লেখকই যে ‘‘পঞ্চমুখে’’ তুর্ক রমণীর ভূবনে-অতুল সুষমার বর্ণনা করে যাচ্ছেন, সব কি তাহলে বিলকুল মিথ্যা? তবে কি তাঁরা কোন কিছু না দেখে শুনেই চক্ষু বুঁজে, শুধু কল্পনার নেশায় মনের চোখে বেচারি তুর্ক-তরুণীদের মূর্তি এঁকে তাদিগকে একেবারে হুর-পরীর সঙ্গে সমান আসন দিয়েছেন? এমন জগদ্বিখ্যাত কবি ও লেখক তুর্ক মহিলার রুপ বর্ণনা করতে করতে তন্ময় হয় গিয়েছেন, যাঁরা দস্তুরমত তুর্ক দেশে ভ্রমন করেছিলেন, তাঁরা যে নেহাৎ কবিত্বপূর্ণ মোলায়েম ধরনে চক্ষু বুঁজে বেড়িয়ে বেড়াননি, এ বোধ হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাছাড়া তুর্কদের দেশ পাশ্চাত্য দেশেরই অন্তর্গত, আর তা নেহায়েত দূরও নয়, অথচ বাবা আদমের কাল হতে আজ পর্যন্ত তুর্ক রমণীদের মুখচন্দ্র কেউ দেখেননি? এবং খামাখা ঘরের খেয়ে বেচারিদের রুপ বর্ণনায় মুখে ফেনা উঠিয়েছেন? আর ঐ আমেরিকান লেখক মহাশয় একজন ‘‘হাম্বা চোম্বা’’ অবতারের মত সটান তুর্কস্থানে অবতীর্ণ হয় সারা দুনিয়ার চোখের উপরকার একটা মস্ত পর্দা ফাঁক করে ধরলেন? লেখকের ‘কেরদানি’কে বাহাদুরি দিতে হয় কিন্তু। আর হেমেন্দ্র বাবুও সানাইয়ের পোঁ ধরার মত তাঁর দগ্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছেন যে হুরপরী দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না। তাই দুধের সাধ গোলে মিটানোর মত গানে-গল্পে-কবিতায় প্রসিদ্ধা হুরপরী নামে আখ্যাতা তুর্ক রমণীর রুপ-মাধুর্য শুনেই কোন রকমে নিজের ‘আকুল পিয়াসা’ দমন করে রেখেছিলেন, — এমন সময় ‘দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠের’ মত সশরীরে আমেরিকান লেখক মশায় মৃত্তিকা ভেদ করে উঠে একেবারে ‘‘চিচিং ফাঁক’’ করে দিলেন বা মাঝ মাঠে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। আসল তুর্ক রমণীরা (দো-আঁসলা নয় অবশ্য।) বাস্তবিকই হুরপরীর চেয়েও সুন্দরী। ও বিষয়ে আমার মত অধমাধমের অদৃষ্ট দগ্ধ না হয়ে খুব স্নিগ্ধই বলতে হবে, কারণ আমি আমার এই চর্মচক্ষে বাস্তব-জগতে যে কয়জন তুর্ক রমণীকে দেখবার সৌন্দর্য লাভ করেছি, তার অন্তত একজন এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টকে বাঙলার স্টেজে হাজির করতে পারলে অনেকেরই ‘মূর্ছা ও পতন’ হত এবং

মাথা খারাপ হয়ে যেত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার সকল জাতির রমণীই (বিশেষত যারা সৌন্দর্যের জন্য বিশ্ব-বিশ্রুত, উদাহরণস্বরুপ—পার্শি, ইরানি, ইহুদি, আরবি প্রভৃতি) দুদশজন করে আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে দেখবার সুযোগ পেয়েছি এবং তা স্বপ্নে নয়, দিব্যলোকে, কল্পনায় নয় বহাল খোশ-তবিয়তে, আর প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফোরিত করে। কিন্তু কই তুর্ক মহিলার মত এমন ভূবন-ভূলানো রুপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আর পোড়া চোখে পড়লো না। তবে হতে পারে, হয়ত ঐ তরুণীদের রুপাগ্নি আমার চোখ ঝলসে দিয়েছে, তাই আর দুনিয়ার কোথাও সুন্দরী দেখতে পাই না।

হেমেন্দ্র বাবু পরের মুখে ঝাল খেয়ে একেবারে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বলে ফেলেছেন, ‘‘তুর্ক রমণীরা মোটেই সুন্দরী নয়।’’ কেননা একজন সাহেব বলেছেন যখন, তখন তা বেদবাক্য। একটু রসিকতার লোভে তাঁর মত লোকের পক্ষে একজন খামখেয়ালি লেখকের ছেঁদো কথায় সায় দেওয়া উচিত ছিল না। সাহেবের সুরারাগরঞ্জিত নয়নে ওঁদেরই স্বজাতির মত ‘ওল ছিলা’ চেহারা হলেই বোধ হয় বেশ সুন্দরীটি হয়, সেও ত এক সাংঘাতিক ব্যাপার। হেমেন্দ্র বাবু ইচ্ছা করলে অন্তত সিরাজী সাহেবের কাছেও এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারতেন।

পিকিং হতে আমদানি বেঢপ মুখ, হাবশির দেশ হতে রপ্তানি বিটকেল কুচকুচে মুখ ‘‘লিভান্টিয়ান,’’ ‘‘সার্কোসিয়ান’’ বা ‘‘স্ক্যান্ডিনেভিয়ান’’ দেশের চ্যাপ্টা বেখাপ্পা মুখ ইত্যাদি যে সব পাঁচমিশালী মুখ সাহেব-পুঙ্গব তুর্কিদের মাঝে দেখেছেন, তাই নিয়ে যদি তুর্ক তরুণীর সুষমা সম্বন্ধে ঐ রকম বীভৎস মত পোষণ করেন, তাহলে আমাদের বলবার কিছুই নাই। তাহলে সাহেবেরই জয়! তাছাড়া লেখক জানেন এবং স্বীকারও করেছেন, ‘‘তুর্কিরা নানা দেশ হতে নানা জাতের বন্দিনী জোগাড় করে আনত, আর তাদেরই সঙ্গে অবাধ রক্ত-মিশ্রণের ফলে এই অসংখ্য ও বিচিত্র মুখাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে।’’ অতএব সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে শুধু এই গজঘন্ট, রঙ-বেরঙের মুখ আদৌ তুর্কির নয়, ওসব হচ্ছে বাঁদীদের মিশ্র মুখ। ঐ সব পাঁচমিশালি মুখই বোধ হয় ঘোমটা খুলে বাইরে বেরিয়ে সাহেবের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

তুর্কিরা আধুনিক পাশ্চাত্য কায়দা-কানুনে কেতাদুরস্ত হলেও এখনও তাদের মেয়েরা পথে ঘোমটা খুলে বেরোয়নি, আর বেরুলেও এমন সাধারণ জায়গায় বেরোয়নি, যাতে তাদের ঐ স্বর্গীয় সুষমা-মাধুরী সাহেবের বিড়াল-নয়ন সার্থক করে দিয়েছিল। সম্ভ্রান্ত আসল তুর্কি মহিলারা হাজার শিক্ষিতা হলেও এখনও রীতিমত বোরকা দিয়ে পথে বের হয়। কাজেই অন্যান্য দেশের মত ‘‘ঘোমটার আড়ালে খেমটার নাচ’’ দেখা লেখকের আর পোড়া কপালে জোটেনি।

এই সব খামখেয়ালি লেখকের কান্ড দেখে আমি নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে, সেই-সাহিব যদি বাঙলায় আসেন, তাহলে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার নমুনা স্বরূপ আমাদের কুললক্ষ্মীদের রুপ বর্ণনা নিম্নলিখিতরূপে করবেন, —
‘‘বাঙালি মেয়েগুলো বিশ্রি কালো, তদুপরি তৈলচিক্কণ হওয়ায় বোধ হয় যেন আবলুস কাঠে ফ্রেঞ্চ পালিস বুলানো হয়েছে। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পাড়াগাঁয়ে থাকে। (বাগদিদের মেয়ে দেখে সাহেব আমাদের বনফুলের মত সুন্দরী কূলবধূদের সম্বন্ধে এই রকম সাংঘাতিক ধারণায় উপনীত হবেন।) তারপর শহুরে তাবৎ স্ত্রীলোকই খুব বেশি রকমের স্থুলাঙ্গিনী, দেহের অনুপাতে উদর ঢক্কা-সম ভীষণ প্রশস্ত, পরিধানে কম-সে-কম দুই তিন থান কাপড়, অঙ্গে খুব ভারী ভারী অলংকার, মুখটি চন্দ্রের মত নয়ই - তবে অনেকটা মালসার মত।’’ (মাড়োয়ারি মেয়েদের দেখে এ-কথায় লিখবে সাহেব, কারণ তারাই বেশির ভাগ বাইরে বেরিয়ে রাস্তার ধুলো উড়োতে উড়োতে কাঁইয়ো মাইয়ো করে যায়। সাহেবের এ বর্ণনা ডাহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আর তাই পড়ে আমাদের সুন্দরী তরুণীরা হাত-পা কামড়িয়ে মরবেন।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, যদি কখনও আমার নসিবে হুরপরী দেখা থাকে তবে তারা কখনও তুর্কি যুবতীর চেয়ে সুন্দরী হবেন না, এ বিষয়ে আমি স্থির-সিদ্ধান্ত হয়ে বসে আছি। এমন

ডাঁষা আঙ্গুর আর পাকা ডালিমের মত মিশানো লাবণ্য, আর আয়নার মত স্বচ্ছ তরল সৌন্দর্য বোধ হয় বেহেস্তেও দুষ্প্রাপ্য। রমণী বিশ্বে সৌন্দর্যের সার যে কত বেশি সুন্দরী হতে পারে, তা তুর্কি তরুণী না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আমিও আমার সোনার বীণার তারে ঘা দিয়ে আকুল কণ্ঠে গেয়ে উঠতাম, —

> ‘‘আগার ফেরদৌস্ বর রুয়ে জামিন আস্ত।
> হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত-ও হামিনাস্ত’’॥

সৌজন্যেঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩-৫।